ছোটবেলায় ঘুড়ি ওড়াতাম ও মার্বেল খেলতাম ঃ সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক

স্টালিন সরকার

ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ছিল। বন্ধু-বান্ধব মিলে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে মাঠে যেতাম। মনের আনন্দে ঘুড়ি ওড়াতাম। ভারতের জলপাইগুড়িতে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গী ছিল শিমু, চিববায়ু, বড় য়া। আর স্কুলের বন্ধু ছিল সুনির্মল, অরুণ। এটা চল্লিশ দশকের কথা। ফুটবল খেলতাম, ডাংগুটি খেলতাম, মার্বেল খেলতাম।

উপরোল্লিখিত কথাগুলো বললেন, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক। ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ইনকিলাবকে তিনি বলেন, জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকায় আসার পর অসংখ্য বন্ধু পেলাম। আনন্দ, উল্লাস করেই কেটেছে আমার তখনকার দিনগুলো।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, আমি তখন জলপাইগুড়িতে ক্লাস ওয়ানে পড়ি। আমার অনেক বন্ধু ছিল। বন্ধুরা নিজেরা ঝগড়া করতাম। আবার পরক্ষণেই মিলে যেতাম। স্কুলে যারা ওয়ানে পড়তেন তাদের সকলের বাসা থেকে বাবা-মায়েরা পকেটে পেন্সিল বেঁধে দিতেন। কারণ আমরা প্রায় দিনই পেন্সিল, বই হারাতাম। একদিন স্কুলের ক্লাস চলছে। আগেই বলে রাখি আমার বাবা ওই স্কুলের হেড মৌলভী ছিলেন। পকেটে দেখি পেন্সিল নেই। পেন্সিল গেল কোথায়? পাশের বেঞ্চে বসা ছেলেটির হাতে আমার পেন্সিলের মত একটা পেন্সিল দেখলাম। আমি বললাম, ওইটাই আমার পেন্সিল। ছেলেটি বলল পেন্সিলটি তার। ক্লাসের স্যার ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলেন। স্যার এসে কি হয়েছে জানতে চাইলে বললাম স্যার আমার পেন্সিল সে নিয়েছে। ছেলেটি বলল, না স্যার এটা আমার পেন্সিল। দু'জনের কথা শোনার পর ক্লাসের স্যার পেন্সিলটি নিয়ে আমাকে দিলেন। সেই ছেলে আমাকে পেন্সিলটি দিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে। বাসায় এসে দেখি আমার পেন্সিল টেবিলের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আসলে ওটা ওরই পেন্সিল ছিল। নিজের পেন্সিল টেবিলে দেখে খুবই লজ্জা পেলাম। কষ্টও পেয়েছিলাম নিজের ভুলের জন্য। তখন কতইবা বয়স ছিল। তারপরও স্কুলের ঘটনার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হল। ছোটবেলার সেই স্মৃতি এখনো ভুলতে পারিনি। আরেকটি ঘটনার কথা বলি। বাবা ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের একপর্যায়ে কংগ্রেস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আমাদের স্কুলে ধর্মঘট করা হয়েছে। স্কুলের গেটের সামনে ধর্মঘটী লোকজন শুয়ে-বসে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে এসবের কিছুই বুঝতাম না। মুসলিম লীগের সমর্থক হিসেবে বাবা ছিলেন ধর্মঘটের বিপক্ষে। স্কুলে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। বাবার হাত ধরে ধর্মঘটী লোকজন যারা শুয়ে আছে তাদের টপকিয়ে আমরা স্কুলে গেলাম। সে স্মৃতিও এখন মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। পরে যখন বুঝার মত

বয়স হল তখন ঘটনার কথা মনে পড়লে নিজেই লজ্জা পেতাম।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক নিজের বেড়ে ওঠার কথা জানাতে গিয়ে বললেন, পিছনের কিছু কথা বলা দরকার। আমার বাবার নাম মৌলভী সিদ্দিক আহমেদ। তিনি মারা গেছেন। মায়ের নাম আলিফা খাতুন। বয়স এখন ৮৫ বছর। আমরা ৬ ভাই, ৩ বোন। বড় ভাই সালাহউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন। আরেক ভাই সিরাজউদ্দিন আহমেদও বেঁচে নেই। আরেক ভাই গিয়াসউদ্দিন আহমেদ লেখাপড়ার জন্য প্যারিস গিয়ে আর ফেরেনি। সেখানেই বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আরেক ভাই ডাঃ প্রফেসর শফিক উদ্দিন আহমেদ– নিউরো সার্জেন। আরেক ভাই সহিদউদ্দিন আহমেদ সেলিম খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত। বোনদের মধ্যে বড় বোন জাহানারা বেগম খুকি এখনো বেঁচে আছেন। তিনি বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। রওশন আরা বেগম বেনু মারা গেছেন। আরেক বোন মুন্নি। আমাদের আদি নিবাস ফেনী জেলার পরশুরাম থানার ধনীকুণ্ডা গ্রামে। আমাদের এলাকায় বিয়ে করেছিলেন জলপাইগুড়ির নবাব মোশাররফ হোসেন। তিনিই আমার বাবাকে জলপাইগুড়ি নিয়ে যান। তখন আমার বাবা সিদ্দিক আহমেদ চিটাগাং মাদ্রাসা থেকে উল্লা পাস করেছিলেন। বাবাকে জলপাইগুড়ি নিয়ে গিয়ে স্কুলে চাকরি দেন নবাব মোশাররফ হোসেন। আজকের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পিতা ইস্কান্দার মজুমদারকেও ওই নবাব মোশাররফ হোসেন জলপাইগুড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা মাস্টারি করতেন আর খালেদা জিয়ার বাবা ইস্কান্দার মজুমদার চায়ের বাগানে ব্রোকারি করতেন। সে সময় জলপাইগুড়ি ডমিনেট করতো মুসলমানরাই। বাবা অনেক কষ্ট করেছেন। স্কুলের চাকরিতে সামান্য বেতন পেতেন। তিনি কষ্ট করে জলপাইগুড়িতে একটি বাড়ী করেছিলেন। রাতে বাবা নিজে মাটি কাটতেন। আর টুকরিতে করে সে মাটি মা বাড়ীতে নিয়ে ফেলতেন। এভাবে বাবা বাড়ী করেন। ২০০০ সালে শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। দেখে এসেছি আমার জন্মস্থান। আমার দাদার ছিল বড় সংসার। বাবা সংসারের সবকিছু দেখাশোনা করতেন। তিনি তার ভাইদেরও নিয়ে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি। একবার জলপাইগুড়িতে আমাদের বাসায় আগুন লাগল। লোকজন ছুটাছুটি করে এসে বাড়ীর আগুন নেভাল। ঘরের দেয়ালে আমার চাবির রিং আটকানো ছিল। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত। আর আমি আমার ওই চাবি রিং পাড়ার জন্য অস্থির। লাফিয়ে লাফিয়ে সেটি নেয়ার চেষ্টা করছি। এক সময় চাচা এসে চাবিটি পেরে দেন। সেই স্মৃতি মানসপটে এখনো ভেসে ওঠে।

ঢাকায় আসার কথা বলি। ঢাকার গোপীবাগে আমার মামা থাকতেন। আমরা জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকায় চলে এলাম এবং মামার বাসায় উঠলাম। গোপীবাগে মামার বাড়ীতে অনেক দিন ছিলাম। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক। মামার বাসায় জায়গা কম। এক সময় বাবা ৫ কাঠা জমির একটি বাড়ী ১২ হাজার ৭শ' টাকা দিয়ে কিনলেন। তখন এই গোপীবাগে ৩/৪টি বাড়ী ছিল। বাবার সংসারে অর্থনৈতিক সংকট ছিল। কোথাও চাকরি পেলেন না। এক সময় বাবা ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ছোটবেলা থেকেই আমি খেলাধুলা করতাম। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ১৯৪৮ সালে আমরা কয়েকজন মিলে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলাম। আজকের প্রবীণ সাংবাদিক এ বি এম মুসাও এই ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। আমি ছায়ানটের যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। 'অন্তরে আপন' নামের একটি বয়স্ক সংগঠনেরও নেতৃত্ব দিয়েছি। 'গোপীবাগ নেভল কাউন্সিল' আমরা গঠন করলাম। সাংস্কৃতিক সংসদও প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। অর্থাৎ গোপীবাগে আসার পর খেলাধুলা আর সংস্কৃতি চর্চা নিয়েই মেতে ওঠলাম। প্রথমে আমাকে ভর্তি করা হল প্রিয়নাথ হাই স্কুলে (বর্তমানে নবাবপুর হাই স্কুল)। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটারদের টিমে ট্রেনিং নিয়েছি। ভাল ক্রিকেটার ছিলাম। একবার একটি শক্তিশালী দলের সঙ্গে আমাদের খেলা। প্রচুর দর্শক। খেলোয়াড়দের মধ্যে বয়সে আমিই ছোট। বুক কাঁপছে। দুরু দুরু বুকে ওপেনার ব্যাটসম্যান হিসেবে মাঠে নামলাম। চাঁদ খান নামের এক নামকরা ফাস্ট বোলার আমাদের বিপক্ষের দলে ছিল। তার একটি বলে আমি চার মারলাম। চার মারার পর খেলায় আমার ফর্ম আসে। খুব ভাল খেলছি। মধ্য বিরতির সময় সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমিও দারুন খুশি। অবস্থা দেখে বড় ভাই গোছের একজন সবার সঙ্গে রাগতঃস্বরে বললেন, ছেলেটা ভাল খেলেছে। প্রশংসা করে ছেলেটাকে নষ্ট করে দেবে। ও হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছি। আমরা নিয়মিত খেলা দেখতাম। আজকে স্টেডিয়ামের অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিল। টিন দিয়ে মাঠ ঘেরা। আমরা ছিলাম ঢাকা ওয়ান্ডার্স ক্লাবের সাপোর্টার। এই ক্লাবটি তখনকার যুগে মুসলমানদের ক্লাব হিসেবে পরিচিত ছিল। মাঠে খেলা হবে অথচ আমাদের হাতে পয়সা নেই। কয়েকজন বন্ধু

মিলে খেলা দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। একপর্যায়ে বন্ধুরা মিলে টিনের নিচের মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ করলাম। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে শেয়ালের মত ভিতরে ঢুকে খেলা দেখেছি।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, আমি খেলাধুলা আর সংস্কৃতি চর্চা নিয়েই ছিলাম। কিন্তু কমরেড ফরহাদ ভাই আমাকে সময়ের প্রয়োজনে জোর করেই রাজনীতির মাঠে নামালেন। ১৯৫২ সালে ছাত্র ইউনিয়ন হলেও আমি যুবলীগ করতাম। সেটাও ছিল অনিয়মিত। আজকে যে দেয়াল লিখনকে চিকা মারা বলা হয় সেটা আমরাই প্রচলন করেছি। ঘটনাটির কথা বলি। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন জারী ছিল। পোস্টার লাগলে কঠোর শাস্তি হত। একদিন আমরা গোপন বৈঠক করলাম। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল ২১ ফেব্রুয়ারীর রাতে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে মিছিল করব; কিন্তু পহেলা ফেব্রুয়ারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হল। ফলে আমরা ৬ ফেব্রুয়ারী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৫ ফেব্রুয়ারী ফরহাদ ভাই (কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ) আমাকে বললেন, তোমার হাতের লেখাতো খুব ভাল। তুমি কিছু রং আর দু'টি ব্রাশ কিনে নিয়ে আস। তখন সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছে। পত্র-পত্রিকায় সেসব খবর পড়তাম। রং আর দু'টি ব্রাশ কিনে আনা হল অতি গোপনে। সন্ধ্যার সময় ফরহাদ ভাই আমাদের দু'ভাগ করে দিলেন। একদল পোস্টার লাগাবে আর অন্য দল দেয়ালে লিখবে। আমরা কয়েকজন বর্তমানে হাই কোর্টের বিচারপতি বদরুল হক, বিটপীর মালিক রেজা আলী, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, দীলিপ রোজারিও, সামসুল আলম বাঙ্গাল দেয়ালে লিখতে গেলাম। প্রথমে ফজলুল হক হলের পাশের একটি দেয়ালে লিখলাম 'পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা চলবে না'। বদরুল হকের দায়িত্ব ছিল পাহারা দেয়া। কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন। আর রেজা আলীর পকেটে ছিল রংয়ের কোটা। আমার হাতে ব্রাশ। এভাবে কয়েকটি দেয়ালে লেখার পর সেগুন বাগিচায় এসেছি। তখন পুলিশ টের পেয়ে আমাদের ধাওয়া করে। আমরা দৌড়ে গিয়ে ফজলুল হক হলে গেলাম। সবকিছু পুকুরে ফেলে দিলাম।

আরেকটি কথা বলি। রেজা আলীদের বাসা ছিল সেগুন বাগিচায়। আমরা বন্ধুরা খুব আড্ডাবাজ ছিলাম। রাতে রেজা আলী গোপনে তাদের গাড়ীর চাবি নিতেন। বাসা থেকে অতি গোপনে গাড়ী বের করতাম কয়েকজন মিলে। গাড়ী ঠেলে আনতাম প্রেস ক্লাবের কাছে। তারপর ছুটতাম। কোন দিন মানিকগঞ্জ, কোন দিন সাভার, কোন দিন নারায়ণগঞ্জ যেতাম। নারায়ণগঞ্জে লুচিপুড়ি খেতাম। হয়তোবা কোন ফাঁকা মাঠে গিয়ে কয়েক বন্ধু শুয়ে পড়তাম। শেষ রাতে বাসায় ফিরতাম। এমন এক সময় আইয়ুব খান পূর্ব বাংলা সফরে আসবেন। সারা ঢাকা শহরে অসংখ্য তোড়ণ নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা কয়েক বন্ধু ওসমান গনি রোডের ফুটপাতে বসে আড্ডা দিচ্ছি। তখন হঠাৎ মনে হল কিছু একটা করা দরকার। তোড়ণগুলোতে আগুন দেয়া দরকার। তখন পাশের গর্ত থেকে একটি চিকা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। আমি দৌড়ে সে চিকা মারার জন্য রাস্তা পার হই। তখন আমাদের মধ্যে হৈচৈ হয়। দেয়াল লিখন শব্দটা পরিচিত হওয়ায় তখন থেকেই আমরা দেয়াল লিখনের পরিবর্তে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে চিকা মারা শব্দটার ব্যবহার শুরু করি। আরও অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য স্মৃতি আছে শৈশবকে ঘির। সেসব স্মৃতি লিখতে গেলেতো বিরাট বই হয়ে যাবে।